খাদ্য নিরাপত্তা নীতি বনাম মাঠের বাস্তবতা: প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও উত্তরণের পথ

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং তার নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানের সবচেয়ে বড় পরিমাপক হলো খাদ্য নিরাপত্তা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব এবং ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের পুষ্টিগত স্তর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশ দানাদার খাদ্য উৎপাদনে দৃশ্যমান স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও সাম্প্রতিক বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি, সামষ্টিক অর্থনীতির অস্থিরতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী অভিঘাত আমাদের খাদ্য ব্যবস্থার ভেতরের দুর্বলতাগুলোকে নগ্নভাবে উন্মোচিত করেছে। কাগজে কলমে আমাদের 'জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নীতি ২০২০' অত্যন্ত প্রগতিশীল হলেও মাঠের নির্মম বাস্তবতার সাথে এর দূরত্ব দিনদিন বাড়ছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর সর্বশেষ মে ২০২৬-এর উপাত্ত বলছে, দেশে বর্তমানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৮.৩৯ শতাংশ। এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির বাজারে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় ও মজুরি বৃদ্ধির হার (৮.১৬%) সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়াতে, মধ্য ও নিম্নবিত্তের থালায় পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান সংকুচিত হয়ে আসছে। নীতিমালার সুন্দর তাত্ত্বিক বুনন যখন মাঠ পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার কারণে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তখন তা কেবল একটি দাপ্তরিক দলিলে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

খাদ্য নিরাপত্তার চতুর্মাত্রিক ডাইমেনশন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (FAO) সংজ্ঞা অনুযায়ী, খাদ্য নিরাপত্তা কেবল চাল-গমের উৎপাদন বৃদ্ধির নাম নয়, বরং এটি চারটি সমান্তরাল স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভসমূহ হচ্ছে সহজলভ্যতা, অর্থনৈতিক ক্রয়ক্ষমতা, খাদ্যের সঠিক ব্যবহার ও পুষ্টিমান এবং স্থিতিশীলতা।

'গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস ২০২৬' (GRFC 2026)-এর তথ্য অনুসারে, এখনও দেশের ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্য বাজারে প্রবেশাধিকারে অসমতা এবং সুশাসনের অভাব।

২০২৫ সালে উচ্চ মাত্রার তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকা মানুষের সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০ দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। যদিও এই বিশ্লেষণের আওতায় ছিল দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৯ শতাংশ এবং এটি আগাম সতর্কবার্তাই বহন করে। যদিও প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২৪ সালের তুলনায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয়েছে। সংখ্যার হিসেবে ১ বছরে ৭৬ লাখ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকা মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতায় প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাসমূহ হলো নীতিমালার সফল বাস্তবায়ন থমকে যাওয়া। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজটি একক কোন মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়। এর সাথে খাদ্য, কৃষি, বাণিজ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সরাসরি যুক্ত। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে এই মন্ত্রণালয়গুলোর সমান্তরাল সংস্থাসমূহের মধ্যে ডিএই, খাদ্য অধিদপ্তর ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মধ্যে কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের তীব্র অভাব রয়েছে। ফলে, উৎপাদন ও চাহিদার সঠিক ডেটাবেজ গড়ে উঠছে না।

বাংলাদেশের খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার সমস্যা শুধু বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা কিংবা হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির ফল নয়। নিম্ন ও অনিশ্চিত আয়, দুর্বল ক্রয়ক্ষমতা, আঞ্চলিকবৈষম্য, জলবায়ুঝুঁকি, অপুষ্টি এবং সামাজিক সুরক্ষার ঘাটতি সবই এর সাথে জড়িত। এমন অনেক পরিবার আছে যাদের কাছে এই সংকট শুধু বাজারে খাদ্যের অভাব নয়। তাদের কাছে সংকট হলো খাদ্য কেনার সামর্থ্যের অভাব, পুষ্টিকর খাবারের অভাব এবং সংকট সামলানোর আগের উপায়গুলো প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের (BFSA) রয়েছে কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা। ২০১৩ সালের নিরাপদ খাদ্য আইনের অধীনে গঠিত 'BFSA' কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশংসনীয় কিছু উদ্যোগ নিলেও জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তাদের নিজস্ব জনবল ও আধুনিক সায়েন্টিফিক ল্যাবরেটরির রয়েছে তীব্র সংকট। ফলে মাঠ পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে

‘উত্তম কৃষি চর্চা (GAP)’ বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে তৈরি হচ্ছে ক্রনিক ফুড সেফটি ক্রাইসিস।

আইন অনুযায়ী বাজারে পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং সরবরাহ তদারকির দায়িত্ব কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে শক্তিশালী সিন্ডিকেট, কৃত্রিম সংকট তৈরি এবং কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগার কেন্দ্রিক মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে এই সংস্থার আইনি ও প্রায়োগিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। ফলে কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ ভোক্তা কিনছে আকাশছোঁয়া দামে।

দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ওএমএস (OMS) বা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি প্রচলিত থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রাইসিস-রেসপন্সিভ বা তাৎক্ষণিক শক মোচন করতে পারে না। খাদ্য গুদাম ও আধুনিক সাইলো নির্মাণ প্রকল্পের ধীরগতির কারণে আপদকালীন খাদ্য মজুদ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG2) অর্জনের চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ ২০২৬ সালে LDC থেকে উত্তরণ লাভ করার কথা রয়েছে। এই উত্তরণকালীন

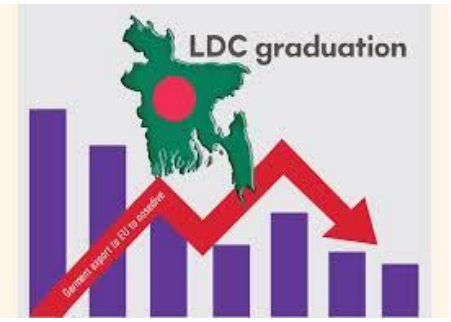

সময়ে আমাদের জিএসপি সুবিধা সংকুচিত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নতুন শর্তাবলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এরই মাঝে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার আগ্রাসন ও অসময়ে বন্যা দেশের উপকূলীয় ও উত্তর চরাঞ্চলের কৃষি উৎপাদনকে চরম ঝুঁকিতে ফেলছে।

রোহিঙ্গা পরিস্থিতি এ সংকটে আরেকটি মাত্রা যোগ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গা আগমন, বন্যা এবং মানবিক সহায়তা কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের দুই জেলায় বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে তীব্র খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা বেড়েছে। এটি কেবলমাত্র মানবিক সংকট নয়, কক্সবাজার ও আশেপাশের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্যও এটি উন্নয়ন সংকট। সহায়তা কমে গেলে স্থানীয় শ্রমবাজার, বন, জনসেবা, পানিসম্প দ এবং সামাজিক সম্পর্কের ওপর চাপ বাড়ে। বাংলাদেশ অনেক বছর ধরে এই বোঝা বহন করছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত নয় এই সংকটকে এড়িয়ে চলা।

FAO-এর সাম্প্রতিক ফুড ব্রিফ অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ বিপণন বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশকে প্রায় ১ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। এই বিশাল আমদানি-নির্ভরতা দেশের সীমিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-২ এবং এসডিজি-১২ অর্জন বাংলাদেশের জন্য একটি বড় প্রাতিষ্ঠানিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সংকট উত্তরণের টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক পথনীতি ও মাঠের বাস্তবতার এই ব্যবধান ঘোচাতে হলে গতানুগতিক সংস্কারের বাইরে গিয়ে প্রয়োজন আমূল প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর।

তাই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ না করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'National Food Security Council' গঠন করা প্রয়োজন। এই কাউন্সিল কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে সঠিক পরামর্শ ও কার্যক্রমের সেন্ট্রাল মনিটরিং করবে।

মধ্যস্বত্বভোগীদের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির কারসাজি রুখতে 'কৃষক অ্যাপ' এর মাধ্যমে সরাসরি পাইকারি বাজারে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে খামার থেকে ভোক্তার থালা পর্যন্ত (Farm to Table) পণ্যের দাম ও গুণগত মান ট্র্যাক করার ব্যবস্থা চালু করা সময়ের দাবি। সারাদেশের প্রতিটি জেলায় বিএফএসএ এর স্থায়ী পরীক্ষাগার স্থাপন এবং উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ 'ফুড সেফটি ল্যাব' পরিচালনা করতে হবে। খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিকের উপস্থিতি শনাক্তে জিরো-টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। সনাতনী পদ্ধতি পরিবর্তন করে ফোর্টিফাইড রাইস, ডাল ও ভোজ্যতেল অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশের লবণাক্ত ও খরাপ্রবণ অঞ্চলে ব্রি (BRRI) ও বারি (BARI) উদ্ভাবিত জলবায়ু-সহিষ্ণু জাতের বীজ পৌঁছানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আধুনিকীকরণ করতে হবে।

ড্রোন ও আইওটি (IoT) ভিত্তিক প্রিসিশন এগ্রিকালচার টেকনোলজির ব্যবহারে সরকারি প্রণোদনা বাড়াতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা কোনো একক বিচ্ছিন্ন লক্ষ্য নয়, এটি দেশের সার্বভৌম, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেধা বিকাশের মূল ভিত্তি। চমৎকার সব নীতিমালা প্রণয়নে

আমাদের যে পারঙ্গমতা রয়েছে, তা মাঠ পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে।

সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান চ্যালেঞ্জ এবং ২০২৬-এর বৈশ্বিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো দূর করা এখন আর বিলাসী ভাবনা নয়, বরং এটি জাতীয়ভাবে টিকে থাকার লড়াই। নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে উন্নত বাংলাদেশ অধরাই রয়ে যাবে। সবার আগে বাংলাদেশ ভাবনাই হতে পারে পরিত্রাণের মূলমন্ত্র।